বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের পরিচয়

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

ABSTRACT:-

এই গ্রহে সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণের প্রবণতা তাদের মধ্যে বিচরণ লালসা জাগ্রত করেছে। বর্তমান সময়ে, লোকেরা উচ্চ শিক্ষা, পেশাগত চাহিদা বা ধর্মীয় কারণে তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে অন্য জায়গায় যেতে পছন্দ করে। মানুষ শুধু পরিবর্তনের জন্য নয়, অন্বেষণের জন্যও ভ্রমণ করে, যার ফলে কল্পনার প্রসারণে অবদান রাখে। মানুষের অন্বেষণ সেই কৌতূহলের জন্ম দেয় যেখান থেকে সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ভ্রমণ সাহিত্য বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় বিষয় অন্বেষণ. করে। তাই বাঙালি ভ্রমণ আখ্যান লোভনীয় এবং রোমাঞ্চকর। দুর্গাচরণ রায়ের ‘দেবতাদের মর্ত্যে আগমন’ (১৮৮০) থেকে শুরু করে কৃষ্ণা বসুর ‘ভ্রমণ দেশে দেশে’ (২০২২)- বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের ভ্রমণ কাহিনী দেখা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পালামৌ’ (১৮৮০)-এ ছোটোনাগপুরের মালভূমির পাহাড়, নদী এবং বনের বর্ণনা দিয়েছেন।বাংলায় লেখা বেশ কিছু বই হিমালয় সম্পর্কেও কৌতূহল জাগিয়েছে, বিশেষ করে হিমালয়ের চূড়ার সাথে সম্পর্কিত। প্রবোধকুমার সান্যালের ‘মহাপ্রস্থানের পথে’, ‘দেবতাত্মা হিমালয়’, বীরেন্দ্রকুমার রায়ের ‘হিমাচলম’ এবং রামানন্দ ভারতীর ‘হিমারণ্য’ এই ধরণের কিছু উদাহরণ। অতুল চন্দ্র গুপ্তের ‘নদীপথে’ বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘পথে-প্রবাস’, মনোজ বসুর ‘চিন দেখে এলাম’, ‘সোভিয়েতের দেশে দেশে’, এবং দেবেশ রায়ের ‘রাজোসি’ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার আওতায় এসেছে। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ‘ইউরোপ প্রবাসির পত্র’ বা ‘রাশিয়ার চিঠি’রও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘গঙ্গাবতরণ’, নবনীতা দেবসেনের ‘ হে পূর্ণ তব চরণের কাছে’, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ‘হিন্দুতীর্থ পরিক্রমা’ তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ ছাড়া আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রচনার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও রয়েছে। তদুপরি, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভ্রমণ আখ্যান রচিত হয়েছে। এই ভ্রমণ কাহিনীগুলো ছোটগল্প বা উপন্যাস পড়ার মতই উপভোগ্য। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য এইভাবে তার সূচনাকাল থেকেই স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

KEY WORDS:

বৈচিত্র্যময়, তথ্যসমৃদ্ধ, আবেগদীপ্ততায় পরিপূর্ণ এক নতুন ধারার পরিচায়ক।

মূল প্রবন্ধ-

বাঙালি মাত্রেই ভ্রমণপ্রিয়-এই ভ্রমণপিপাসুদের কেউ করেন ইতিহাসের অনুসন্ধান, কেউ যান প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজনে, কেউ দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে ভাবেন ‘দেখব এবার জগৎটাকে’, কেউ মাটিতে দেবতাকে খোঁজেন, ধ্যানমগ্ন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলেন প্রকৃতি প্রেমিকের দল, কেউবা যৌবনের উদ্দীপনায় অ্যাডভেঞ্চারের লক্ষ্যে ভ্রমণ করেন, উদ্দেশ্য হয়তো ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা সেই বিশ্ব তথা ভারতভূমির প্রাণরস আস্বাদন। তাই হিউয়েন সাং, মেগাস্থিনিস ,ফা-হিয়েন বা মার্কো পোলো কিংবা সংস্কৃতির ধারক রাহুল সাংকৃত্যায়ন আমাদের এই ভ্রমণপিপাসাকে জাগ্রত করেছেন।তাঁদের ভ্রমণ বিবরণী আমাদের কৌতূহল ও জ্ঞানের পাথেয় হয়েছে।

উপনিষদে বলা হয়েছে চরৈবেতি, চরৈবেতি অর্থাৎ অগ্রসর হও,এগিয়ে যাও।এই নিরন্তর অগ্রসর হওয়ার মধ্যে একটি কারণ প্রকট হতে দেখা যায়।সেই কারণটি হল দার্শনিক। এই যে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কবে সৃষ্টি বা কোন অলঙঘ্য নিয়মে প্রতিনিয়ত আমাদের এই পৃথিবী বার্ষিক ও আহ্নিক গতিতে ছুটে চলেছে, সেই অজানা অসীমের অন্বেষণে মানুষের জিজ্ঞাসু-চিত্ত স্থির হতে পারে না।প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও বৈচিত্র্য-সৌন্দর্য দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এই কৌতূহল আরও তীব্র হয়।তাই সেই রূপবৈচিত্র্য উপভোগ ও চাক্ষুষ করার জন্য মানুষ এক স্থানে আবদ্ধ হতে চায় না।এক স্থান থেকে থেকে অন্য স্থানে গমন করতে না পারলে তার বিরাম নেই, স্বস্তি নেই।এই বিরামহীন ভ্রমণ পিপাসার প্রাথমিক কারণ হিসেবে এই দিকটিকে নির্দেশ করা যেতে পারে।তবে শুধু অসীমের ব্যঞ্জনা বা কৌতূহলের বিষয় মানুষের ভ্রমণের কারণ হতে পারে না। তার সঙ্গে রুচি, পেশা, আর্থিক সঙ্গতি, সংস্কার, শিক্ষা সর্বোপরি মনের ভালোলাগার বিষয়টিও জড়িত আছে।কোনও একস্থানে একনাগাড়ে বসবাস বা পেশাগত কারণে থাকতে হলে মানুষের চিত্তে অবসাদ আসে।মানুষের মন তখন একটু অবসর বা ছুটি চায়।প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনের পর বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। তাই প্রাত্যহিকতার একঘেঁয়েমি থেকে পরিবর্তনের জন্য মানুষ বেরিয়ে পড়তে চায়। আবহাওয়াকে পরিবর্তিত করে মনকে প্রফুল্ল করে নিতে চায়।তখন ভ্রমণ ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

ভ্রমণের শিক্ষাগত দিকটির মূল্যও অপরিসীম স্কুল-কলেজে,পাঠাগারে, বিতর্ক সভায় মানুষ সার্থক শিক্ষা পায় না। পৃথিবীতে এমন স্থান আছে যা ঐতিহাসিক খ্যাতি, ধর্মীয় আবেদন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার মূর্ত প্রতীক। তাই তাজমহল-কে আমরা শাহজাহান- মুমতাজের দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক বলে মনে করি।তেমনই কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আমাদের ধর্মবোধের বিশ্বাস জাগায়।আজমির শরিফের দরগা আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখে। কৈলাস পর্বত বা মানস সরোবর আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রকৃতির অপার বিস্ময়ের প্রতি সম্ভ্রম রচনা করে।এই সমস্ত স্থানকে চাক্ষুষ দর্শন করলে তবেই প্রকৃত শিক্ষা সম্পন্ন হয়।সেইজন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের আবশ্যিক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।সভ্যতার মানুষ যদি প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে দেশান্তরে গমন না করতো তবে মানুষের সভ্যতা এক স্থানেই সংঘটিত হতো। এতে শিল্পসংস্কৃতির আদান-প্রদান ও খাদ্যাভাস কিছুই পরিবর্তিত হত না।

পাখির যেমন নীড়ও চাই, আকাশও চাই তেমনই মানুষের মধ্যেও এই পক্ষিসুলভ উড্ডীয়মান কামনা আছে। এই নীড় বা আকাশ এক বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে। তা হলো কল্পনার, চিন্তার, মননের। মানসিক উদারতা বিশালতা ও বিস্তৃতির মূল উপকরণ বা প্রয়োজন স্থানিক পরিবর্তন। তাই মহাপুরুষরা, যাঁরা আমাদের নিত্য নমস্য তাঁরা দেশসেবা বা ভক্তিভাবের উৎকর্ষ বিধানে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেশকে জানার বা সাহিত্যের নির্মিতি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন। তাঁদের ভ্রমণ-বিবরণী আমাদের সাহিত্য চেতনা, আধ্যাত্মিক চেতনা বা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট করেছে। মানুষের এই যে ভ্রমণ তা শুধু ভ্রমণের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় না। ভ্রমণের আনন্দকে ধরে রাখার জন্য মানুষের একান্ত আগ্রহ জন্মায়।এই ঐকান্তিক আগ্রহের

ভূমিকা নেয় সাহিত্য। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয়, তাকেই ভ্রমণ-সাহিত্য বলা যায়।পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও ভ্রমণকাহিনী আছে।তাই এর স্বরূপ উদঘাটনের প্রাক্কালে এই দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক নয়, অপ্রয়োজনীয়ও নয়।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। এখনও দেড়'শ বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের যে সার্থক রূপান্তর চোখে পড়ে, তা সত্যিই বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর। এই ভ্রমণ সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই একটি পরিণত সম্ভাবনার বীজ প্রোথিত ছিল।আমরা যদি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করি, তবে এর যথার্থতা সহজে অনুধাবন করতে পারবো।

ভ্রমণের মধ্যে আছে নূতনের প্রতি আকর্ষণ ও রোমাঞ্চ।বিভিন্ন দেশ, জাতি,তাদের ধর্ম, সংস্কার, আচরণ, ঐতিহ্য, আর্থিক অবস্থা এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ও কৌতূহল নিয়েই মানুষ দেশভ্রমণে আগ্রহী হয়।পরবর্তীকালে যখন সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্য রসে জারিত করে তার মূর্তরূপ প্রকাশ করে তখন সেই কৌতূহল বা রোমাঞ্চকে জাগ্রত না করলে চলে না।তবে কৌতূহল নিবৃত্তিই ভ্রমণ সাহিত্য রচয়িতার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।যিনি ভ্রমণ সাহিত্য লিখতে আগ্রহী বা প্রয়াসী হবেন, তাঁকে শিক্ষিত, মার্জিত ও নিরপেক্ষ হতে হবে।ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যেও সেরূপ মার্জিত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হওয়া চাই। অবশ্য সর্বদা যে তা হবেই তা একেবারেই আশা করা যায় না। আবার বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিমনের স্পর্শও তাঁর লেখায় লক্ষ্য করা যায়।তাই একই স্থানের ভ্রমণকাহিনী লিখতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ভ্রমণ সাহিত্য লিখতে বসে অনেক লেখক 'লিরিক' কবির মত তন্ময় হয়ে পড়েন।সবাই যে সাবজেক্টিভিটিকে প্রশ্রয় দেন তা নয়। অনেকেই যা দেখেছেন বা শুনেছেন তাকেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করেন।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে আমরা দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'[১] কেই চিহ্নিত করতে পারি। এটি প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮০ সালে 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায়। অতএব বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস লিখতে গেলে ঐ ১২৮৭ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী। অর্থাৎ স্বর্গের দেবতারা কেমন করে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছিলেন তা-ই এর মুখ্য বিষয়। এতে গঙ্গার উভয় তীরের প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের পরিচয় আছে। এটি একাধারে ভূগোল ,ইতিহাস এবং জীবনচরিতও বটে। অত্যন্ত উপাদেয় রচনা হিসেবেও এটি উল্লেখযোগ্য। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'পালামৌ'।[২] এটি 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়। লেখক সুবিখ্যাত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম অগ্রজ । 'পালামৌ' তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী।
বাংলা সাহিত্যে 'পালামৌ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশুদ্ধ ভ্রমণ কাহিনী রূপে যে আখ্যানবর্জিত মনোগ্রাহী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব 'পালামৌ' তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছোটনাগপুরের অরণ্য- নদী-গিরিখাত এবং সহবাসী পশুপ্রাণী লেখকের সমবেদনা ও মানবিকতার রসধারায় 'পালামৌ'-এ মাধুর্যমন্ডিত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আজও 'পালামৌ' ভ্রমণ বৃত্তান্ত রূপেই সমাদৃত। তাই একে প্রথম ভ্রমণ- উপন্যাস বলাই শ্রেয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'পালামৌ' সম্পর্কে লিখেছেন-

"সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।"[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরো অনেক ভ্রমণকাহিনীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বোম্বাই প্রবাস'। ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘদিন বোম্বাইতে বসবাস করেছেন। তাঁর সেই প্রবাসী জীবনের

অভিজ্ঞতার ফসল এই গ্রন্থটি।এতে বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই সাহিত্যমূল্য তুলনামূলকভাবে কম বলে মনে করা হয়।

ভ্রমণ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা।তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে এই সাহিত্যশাখাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার উল্লেখযোগ্য প্রেরণা বোধ হয় হিমালয় পর্বত। হিমালয় তার বিশালত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অসামান্য রহস্যে আচ্ছন্ন, তার আকর্ষণ অমোঘ। তাই হিমালয়-ভ্রমণ কথাই আমাদের ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য বিষয়।এই হিমালয়-নির্ভর ভ্রমণ সাহিত্যের আংশিক পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে খুঁজে পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন রচনায়। যেমন- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'।[৪] এখানে হিমালয়ের দুর্গম পথ, এই অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি, সেখানকার মানুষ সর্বোপরি সেস্থানের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নৈঃশব্দ্যের সমুন্নত প্রশান্তি উক্ত রচনায় উৎকণ্ঠা-রোমাঞ্চে এবং আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধির গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হিমালয় যে সাধনা ও সত্য-অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত তার সঙ্গে নতুন করে একটি ভ্রমণ ভাবনার সংগতি নির্দিষ্ট হলো বলা চলে। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সূচনালগ্নে এ জাতীয় মনোভাবের প্রেরণা আন্তরিক ছিল বলেই তা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর প্রবোধকুমার সান্যালের নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি একাধিকবার হিমালয় ভ্রমণ করেছেন ও তা নিয়ে ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছেন। তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়'গ্রন্থে হিমালয় ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনীতে আমরা লেখকের নিরাসক্ত, সৌন্দর্য-অনুরাগী ও কৌতূহলী মনকে খুঁজে পাই। হিমালয়ের এরূপ নিখুঁত বিবরণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। হিমালয় সম্বন্ধে একটি মহান আধ্যাত্মিক অনুভূতি বহু যুগ ধরেই বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে প্রোথিত ছিল। প্রবোধকুমার সান্যাল ঐ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে পাঠকচিত্তে রূপময় করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তাছাড়া হিমালয়ের যে একটি প্রাকৃতিক ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্য আছে, তার সম্বন্ধে বিচিত্র কল্পনা বা মিথ আছে তাও লেখক পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত করতে পেরেছেন। 'উত্তর হিমালয় চরিত' এই পর্যায়ের একটি গ্রন্থ। অবধূতের 'নীলকন্ঠ হিমালয়' গ্রন্থেও হিমালয়ের এই আধ্যাত্ম গম্ভীর রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'হিমাচলম' এই পর্যায়ের আরেকটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কুয়ারী গিরিপথে' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এছাড়া রামানন্দ ভারতীর 'হিমারণ্য' গ্রন্থটির নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পন্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য ওরফে রামানন্দ ভারতী ১৮৯৮ সালে দুজন সঙ্গী নিয়ে পায়ে হেঁটে, হিমালয় পার হয়ে, মানস সরোবরে স্নান করে, সেখানকার মন্দিরের বৌদ্ধ পুঁথির গোপন ভান্ডারে আমন্ত্রিত হয়ে সেই পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। তাঁর রচিত 'হিমারণ্য' বইতে সেই পদযাত্রীর কাহিনী পাওয়া যায়। এক অভাবনীয় ও মধুর অভিজ্ঞতার কথা আছে এই বইতে।১৩০৮ সনের বৈশাখ মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।গ্রন্থটি থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক —

"আমি ক্রমাগত দৌড়িয়া একটি উচ্চস্থানে যাইয়া উঠিলাম, সেইখান হইতে সরোবরের দর্শন অতি মনোহর। চারিদিকেই পর্বতমালায় বেষ্টিত, মধ্যে নীল বর্ণ জলরাশি পবনের আবেগে আন্দোলিত হইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতেছে এবং সমুদ্রবৎ ঊর্মিমালায় তীরভাগকে আক্রমণ করিতেছে। যখন ঢেউ ছুটিতেছে তখন বোধ হইতেছে যে নীলবর্ণ জলরাশি হইতে শুভ্র মুক্তামালা উদ্বেলিত হইয়া তীরের দিকে ছুটিতেছে। এই জলের মধ্যে অসংখ্য চক্রবাক-চক্রবাকী ক্রীড়া করিতেছে এবং বহু সংখ্যক রাজহংস মানস-সরোবরের বক্ষে বিচরণ করিতেছে। এই হংস ও সরোবর শ্বেতপদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গে শুভ্র মহাশোভা সম্পন্ন করিতেছে। মানস সরোবরের চতুর্দিকের পর্বতপ্রাচীরও বরফে আবৃত।"[৫] এই অংশটির বর্ণনা অপূর্ব ও চিত্রময়তায় পরিপূর্ণ।

হিমালয় ভ্রমণের আরেকটি অনবদ্য রচনা ভগিনী নিবেদিতার কাশ্মীর ভ্রমণের কাহিনী। যদিও গ্রন্থটি ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে কিন্তু তাঁর বর্ণনা ও মানসিক ঔজ্জ্বল্য ভাষার বিভেদকে বিন্দুমাত্র ম্লান হতে দেয়নি। এ গ্রন্থটি ভগিনী নিবেদিতার 'NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ভারতগতপ্রাণা, পরমবিদূষী, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রবল বিশ্বাসী ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজি গ্রন্থের এই বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত মনগ্রাহী। ১৩২৪ সনে এটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী মুমুক্ষানন্দ। নিম্নে একটি উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি যাতে ভাবের গভীরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সহজেই বোঝা যায় —

"পরদিন আমরা তুষারমন্ডিত পর্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহাই 'কাশ্মীর উপত্যকা' নামে পরিচিত। কিন্তু হয়তো শ্রীনগর উপত্যকা বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। ইসলামাবাদ নগরের নিজের একটি উপত্যকা আছে। সেটি নদীর আরও উপরিভাগে এবং তথায় পৌঁছতে আমাদিগকে পর্বত গুলির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। উপরে সুনীল গগন আর যে জলপথ বাহিয়া যাইতেছিলাম তাহাও নীল। সে পথে মাঝে মাঝে হরিৎবর্ণ পত্রসমন্বিত মৃণালের বড় বড় দল, হেথা-সেথা দু-একটি কোকনদ এবং উভয় তীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত, আসিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কৃষকগণ ফসল কাটিতেছে দেখিলাম। সমস্ত দৃশ্যটিতে নীল হরিৎ এবং ক্ষেতের অপরূপ নিখুঁত সমন্বয়ে কি এমন একটা খোলতাই হইয়াছিল যে ক্ষণকালের জন্য ইহার সৌন্দর্য সম্যকরূপে উপভোগ করিতে যাইয়া হৃদয় একরূপ করুণরসে আপ্‌লুত হইল।"[৬]

এইরূপ বর্ণনা এতই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী যে পাঠকের মানসচক্ষুতে কাশ্মীরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিঁখুত ভাবে ধরা দেয়।।

হিমালয়-ভ্রমণমূলক সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে বিভিন্ন অভিযানমূলক কাহিনীও আছে। অভিযানের আগ্রহ বাঙালি মনে ও মননে উদ্দীপিত হওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্যসিদ্ধ কলমের অধিকারী হবার সুবাদে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি সার্থক উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে। এই অভিযানমূলক সাহিত্যে নিসর্গ চিত্রণ, স্থান ও কালবাচক বর্ণনা, মানুষ, আচার, রীতি প্রকৃতির কথা থাকলেও প্রকৃতিকে জয় করবার প্রেরণাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে দুর্দম ইচ্ছাশক্তি ও যৌবনের স্পর্ধাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।এও একধরণের আত্মানুসন্ধান।তবুও উদ্দেশ্যধর্ম প্রবল বলেই তা অনেকাংশে খন্ডিত ও অস্পষ্টতায় ভরা।তাছাড়া এ জাতীয় রচনায় সাংবাদিকতার রীতি প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা প্রকাশ্য।সেজন্য ব্যক্তিগত অনুভূতি বা মানব মনের অন্তর্গূঢ় সাধনা এখানে পাওয়া যায় না।ফলে নিসর্গচিত্র, পথ, আবহাওয়া, চরিত্র ও ভাবনা পুঙ্খানুপুঙ্খ হলেও শিল্পসিদ্ধ সাহিত্য না হয়ে তা কেবল সাংবাদিকতায় পর্যবসিত হয়। এই অভিযানমূলক সাহিত্যের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ।

বাংলার প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যসুধা স্বচক্ষে দর্শন করবার জন্য যে সকল লেখক নদীপথে ভ্রমণ করেছিলেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত অন্যতম। জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বোটে বহুদিন অতিক্রান্ত করেছিলেন। তাঁর সেই ভ্রমণ বাংলা সাহিত্যকে অমূল্য সব ছোট গল্পের উপহার দিয়েছিল। সেই চলন বিলের প্রকৃতিতে মানুষ, প্রকৃতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সব যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' অত্যন্ত স্বাদু রচনা। ভাষার বাহুল্যহীন স্বাভাবিক চলন ও বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে অন্তরঙ্গ সুর ফুটিয়ে তোলা সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনীর দিকে তাকালেই পরিস্ফুট হবে। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশে ও বিদেশে ভ্রমণ করেন । তাঁর

সেই অভিজ্ঞতা কবির কলমে সাহিত্য হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই ভ্রমণ তালিকা জমজমাট ছিল। তবুও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি লিখেছিলেন —

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
রয়ে গেল অগোচরে।"[৭]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে সার্থক রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে দেশেই গিয়েছেন সে দেশের সঙ্গেই ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যটাকেই যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। আবার এমন অনেক দেশে গিয়েছেন যেখানে তিনি সেই দেশের আচার-ব্যবহার, লোক-নীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সংগ্রহ করবার ইচ্ছাকে ফলবতী করবার প্রয়াস করেছেন। 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

"এখানকার মধ্যবিত্ত মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে হয়, সে ঘর পরিষ্কার আছে কিনা, জিনিসপত্র যথা পরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কিনা ইত্যাদি দেখাশোনা করা, রান্না ও খাবার জিনিস আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নীপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে আজকের সূপ চালিয়ে নেওয়া, পরশুদিনের বাসি রাঁধা মাংস যদি খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তাহলে রূপান্তরিত করা"[৮]

এই ভ্রমণ সাহিত্যের তালিকায় যাঁরা সার্থক সংযোজন তাঁরা হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি,সমরেশ বসু প্রমূখ।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর লেখক জীবনের ঈপ্সিত খ্যাতি অর্জন করেন 'পথে প্রবাসে' প্রকাশিত হওয়ার পর । তাঁর জীবনের অনেক বছর উড়িষ্যায় অতিবাহিত হওয়ার ফলে সাহিত্য সেবার প্রথম যুগে তিনি ওড়িয়া ভাষায় বেশ কিছু গল্প কবিতা লিখেছিলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পরে গ্রন্থবদ্ধ (১৯৩১) করার জন্য অন্নদাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। এই গ্রন্থটিকে ভ্রমণোপন্যাস বলা যেতে পারে। আই.এ.এস পড়ার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তাঁর গৃহিণী লীলা রায় ইংরেজ মহিলা ছিলেন। 'পথে প্রবাসে' ওই প্রবাস জীবন তথা ইউরোপ জীবনে সব মিলিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তাই-ই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীকে গদ্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নিতান্ত অল্প বয়সে এত সুন্দর ভ্রমণসাহিত্য রচনার কৌশল আয়ত্ত করবার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অন্নদাশংকরের লেখার ভঙ্গিটি অতি সরস ও উপাদেয়। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক মনে করেন তিনিও লেখকের ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে উঠেছেন।

এই প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করা যায়, তার আর একটি ভ্রমণ কাহিনী 'জাপান' নামক গ্রন্থে। লেখক একদা লেখকসংঘের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে জাপানের এক সাহিত্যসভায় গিয়েছিলেন। জাপান ভ্রমণের সরস বিশ্লেষণের অন্তরালে লেখকের নিখুঁত ও নিটোল বর্ণনার পারদর্শিতা লক্ষণীয়।

অন্নদাশঙ্করের তৃতীয় ভ্রমণ কাহিনী 'ফেরা'। এই গ্রন্থটিকে 'পথে প্রবাসের' দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। সুদীর্ঘকাল পরে আবার সেই ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত। তবে এবার সেই অশ্বমেধ ঘোড়ার চঞ্চল ও প্রাণবন্ত মুগ্ধতার পরিবর্তে এই

কাহিনী হয়ে উঠেছে একজন অভিজ্ঞ প্রৌঢ়ের চোখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের নূতন ভাঙ্গাগড়ার প্রতিচ্ছবি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পরিচয় তিনি ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখনীতে একটি সুমিষ্ট রোমান্টিক সুবাস অনুভব করা যায়। এই অনুভূতি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে পরিব্যপ্ত। 'তৃণাঙ্কুর' তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, যে তিনি জাত লেখক। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলোতে রমণীয়তার পরিচয় আছে। তাঁর 'কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি','দুয়ার হতে অদূরে' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন মনোজ বসু। তিনি বহু ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের সাহিত্যিক হিসেবে চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের একাধিক দেশে ভ্রমণ করেন। তার সাক্ষ্য বহন করে 'চীন দেখে এলাম', 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', 'পথ চলি' , 'নতুন ইউরোপ', 'নতুন দেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ। এই সমস্ত ভ্রমণ কাহিনী পাঠে জানা যায় যে মনোজ বসু নিরভিমান ও স্বতন্ত্র এক ধারার মানুষ। তিনি ভ্রমণে গিয়ে বিদেশের গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। কোন দেশ শুধু অভিজাত মানুষের দ্বারাই পূর্ণ হয় না, সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ নিয়েই দেশ গঠিত হয়। মনোজ বসুর ভ্রমণ কাহিনীর এই মাটিঘেঁষা মনভঙ্গিটি কারো চোখ এড়িয়ে যায় না। আর একটি কথা উল্লেখ্য করার মত যে লাল চীন ও তৎকালীন সোভিয়েত দেশ সাধারণ মানুষের নিকটে রহস্যের বিষয়, লৌহ যবনিকার অন্তরালে আবদ্ধ। মনোজ বসু ঐ সব দেশে ভ্রমণ করে ঐ লৌহ যবনিকার পটোত্তলন করবার চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর বড় কৃতিত্ব। 'চীন দেখে এলাম' ও 'সোভিয়েতের দেশে দেশে' পাঠ করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের সহজ,সাবলীল রচনাভঙ্গি চোখে পড়ার মত। তাঁর রচনা প্রসাদগুণ সমন্বিত। তাই বারবার পাঠ করলেও ক্লান্তিবোধ হয় না।

মনোজ বসুর পর ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসেবে যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তিনি হলেন দেবেশ দাশ।তাঁর 'রাজোয়ারা', 'রাজসী', 'ইউরোপা','রোম থেকে রমনা','পশ্চিমের জানলা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।'রাজসী' ও 'রাজোয়ারা' হল রাজস্থানের ভ্রমণ কাহিনী,আর বাকি গ্রন্থগুলি ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী।লেখকের অভিজাত শিক্ষিত মনটি তাঁর যাবতীয় রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত একটি অপূর্ব গ্রন্থ। রম্যরচনার স্টাইলে লেখা এই গ্রন্থে আফগানিস্তান ভ্রমণের যে কাহিনী তিনি লিখেছেন এক কথায় তা অনবদ্য। তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে রম্য রচনার সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।'জলডাঙ্গায়' মুজতবা আলীর ভ্রমণ কাহিনীর সার্থক উদাহরণ। প্রাচীন মিশরের যে সুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্রটি আমরা দেখি তা বোধহয় শুধু ইতিহাস পাঠে জানা অসম্ভব।

মুজতবা আলীর মত খোশমেজাজের লেখক পরিমল গোস্বামী। বাংলা সাহিত্যে লেখক পরিমল গোস্বামীর কলমে ভ্রমণ সাহিত্যের জন্ম হতে পারে তা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে। পরিমল বাবুর 'পথে পথে' , 'বনপথের পাঁচালী' তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সহজ ও সরস ভঙ্গিতে বর্ণিত এই ভ্রমণ কাহিনীগুলি এক অভূতপূর্ব ও অনবদ্য ভ্রমণ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসেবে আমরা বুদ্ধদেব বসুর নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর 'সব পেয়েছির দেশে' এর নাম সবারই জানা। এই গ্রন্থটি রম্যরচনার আঙ্গিকে লেখা হলেও বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ তথ্যবহুল। 'দেশান্তর' তাঁর বিদেশ ভ্রমণের একটি সুন্দর চিত্র।'জাপানি জর্নাল' তাঁর জাপান ভ্রমণের মনোরম ও সরস কাহিনী।

ভ্রমণ সাহিত্যের লেখক হিসেবে আর একটি অবিস্মরণীয় নাম সতীনাথ ভাদুড়ী। তার ‘সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী’ একটি অসামান্য গ্রন্থ । বইটি বারবার পড়তে ইচ্ছা করে। লন্ডন ভ্রমণ নিয়ে বাংলায় অনেক কাহিনী লিখিত হয়েছে। তারমধ্যে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘মুখর লন্ডন’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমানীশ গোস্বামীর ‘লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়’ আরও একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

নিখিলরঞ্জন রায় বর্তমানে বাঙালির কাছে একটি বিস্মৃত নাম। তিনিও বহু ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। তাঁর ‘অন্যদেশ’, ‘আপন দেশ’ প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। এই প্রসঙ্গে মৌলানা কাফি খানের নাম করা যায়। তিনি তির্যকভঙ্গির লেখক হলেও তাঁর ‘যদ্দৃষ্টং’ নামক ভ্রমণকাহিনীটি সত্যিই রমণীয়।

বিক্রমাদিত্য নামধারী এক ছদ্মনামী লেখকের ‘দেশে দেশে’ এবং ‘যুদ্ধের ইউরোপ’ প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনী গুলিতে রম্য রচনার স্টাইল ও ডায়েরিসুলভ মনোভঙ্গি প্রকাশ হয়েছে।

তীর্থস্থান ভ্রমণের কাহিনী নিয়ে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে ‘অবধূত’ ও ‘কালকূট’এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবধূতের ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ শুধুমাত্র ভ্রমণ কাহিনী নয়। এতে নর-নারীর সম্পর্ক, সমাজ বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা, মানবিকতা, স্নেহ-মমতা, মানবাত্মার নিপীড়ন সর্বোপরি মানবাত্মার মুক্তি বিধৃত হয়েছে। তাই একে ভ্রমণ সাহিত্য না বলে রোমান্সধর্মী ভ্রমণ-উপন্যাস বলাই শ্রেয়। ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’ লেখক এর আরেকটি ভ্রমণ কাহিনী। সংসারবিবাগী লেখক বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর বৈরাগ্য এক আলোকিত সত্যের জন্ম দিয়েছে। গ্রন্থটিতে শ্মশানভূমির যে বর্ণনা তা একদিকে যেমন ভয়াবহ তেমনই রোমাঞ্চকর। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটুকু লেখকের চেতনায় এক উন্নততর প্রজ্ঞার জন্ম দিয়েছে। এতে পাঠক শুধু ভ্রমণরস নয়, এক নিটোল গল্পরসের পরিচয়ও লাভ করেন।

‘কালকূট’ অর্থাৎ সমরেশ বসুর ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ কুম্ভমেলার অবিস্মরণীয় এক বিভীষিকাময় পটভূমিকায় লেখা। গ্রন্থটি পাঠ করলে বোধগম্য হয় যে লেখক ধর্ম লাভার্থে কুম্ভমেলায় যাননি। তীর্থযাত্রীদের মনের দুর্গম অন্তরালে লেখনী চালনা করে এক অমূল্যরতন আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের ‘একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে’তে গঙ্গার পুণ্য স্রোতধারার দুই তীরে প্রকৃতি ও মানুষের সংসার মিলেমিশে যে জীবনধারা বয়ে চলেছে তারই প্রাণবন্ত ছবি।

শঙ্কু মহারাজের ‘গঙ্গা যমুনার দেশে’ , ‘মধু-বৃন্দাবনে’, ‘বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা’ ‘মানালির মালঞ্চে’, ‘দেশের মাটি’, প্রভৃতি গ্রন্থ তীর্থযাত্রীর হৃদয়াবেগ সমৃদ্ধ ভ্রমণ কাহিনীগুলি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে সার্থক সংযোজন। ভারতীয় জীবন-সাধনার মর্মকোষের সন্ধানে একালের বহু বাঙালি পর্যটক ভারতের বিভিন্ন নদনদীর স্রোতাবহ ধরে ভ্রমণ করেছেন বারংবার। কেউ গিয়েছেন নদীর উৎসে কেউ বা দুই বা ততধিক নদীর সঙ্গমে, কেউ কেউ সাগরের পার ধরে অভিযান করেছেন। কারোর বা পছন্দ জল-জঙ্গল। তাদের সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন আপন আপন কাহিনীর মাধ্যমে। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শংকর নর্মদা’ ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘কাবেরী কাহিনী’ এমনই দুইটি চমৎকার গ্রন্থ।

শঙ্কু মহারাজের ‘বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা’ শুধু ভ্রমণ কাহিনী নয়, গঙ্গা যমুনা নদীর উৎস-সন্ধানে লেখকের ঔৎসুক্য আমাদের বিস্মিত করে। এই গ্রন্থ শুধু ভাবের বা ভাষার মাধুর্যে নয়, সাহিত্যরসেরও আকর বটে।

ঐ একই লেখকের ‘দেশের মাটি’ বাংলাদেশ ভ্রমণের কাহিনী। লেখক পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার আদিবাসিন্দা ছিলেন । স্বাধীনতার পরপরই তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশে যান। তাঁর শৈশব কৈশোরের লীলাভূমি আজ বিদেশ। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে ‘নস্টালজিক’ মনোভাব হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই এটিকে ভ্রমণ কাহিনী না বলে সাহিত্য পদবাচ্য বলাই শ্রেয়।

“ছুটির সময় যখন গ্রামে ফিরতাম তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। চলার পথে একে একে উঁকি দিত বাসন্ডার স্কুল, বাউকাঠির হাট , পিপলিতার রায়ের বাড়ির দরজার মঠ। আরো কত কি, এসব অতিক্রম করলেই দেখা পেতাম গাভা স্কুলের—তখন মন বল্গাহীন, অপূর্ব হিল্লোলে হৃদয়তন্ত্রী উঠতো নেচে। পটে আঁকা ছবির মত আমার গ্রাম পূবের বাড়ির রেইনট্রি গাছের কাছে নৌকা বেঁধে লাফিয়ে পড়তাম পল্লী মায়ের কোলে , শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যেত তখন। তাড়াতাড়ি সোজা রাস্তার লোকের বাড়ির মধ্য দিয়ে ছুটে যেতাম আমার কুটিরে— যেখানে জন্মভূমি সঙ্গে জননীর স্নেহের পরশ ছিল মিশে। তাঁদের দ্বৈত স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি একদিন, কিন্তু আজ? সেসব আকর্ষণী শক্তি কোথায় গেল? নিজের গ্রামে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না কেন? সবকিছু হারিয়ে কেন আমরা সর্বহারা উদ্বাস্তু হয়েছি? স্বাধীনতার জন্যে? সে স্বাধীনতা কোথায়? আবার কবে আমার জন্মভূমির কোলে ঠাঁই পাব, তার দিন গোনা ছাড়া উপায় দেখছি না কিছু। মনকেই প্রশ্ন করছি বারবার — মায়ের ডাকে আবার আমরা মিলবো কবে? কবে মায়ের পায়ে আবার মাথা ঠেকাবার সৌভাগ্য হবে?”[৯]

আর একজন সাহিত্যিক ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করে বিশেষ খাতি লাভ করেছেন তিনি হলেন সুবোধকুমার চক্রবর্তী। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অপরিসীম কৌতূহল। ২৪ টি খন্ডে ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’ রচনা করে কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে অপরূপ চিত্রমালা অংকন করেছেন তা সত্যই অনবদ্য।তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের পর্বটি রোমান্টিক কাহিনীর সূক্ষ্মসূত্রে বন্ধন করা হয়েছে। এত দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী অন্য কোনও সাহিত্যিক রচনা করতে পারেননি। তাই ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’ ভ্রমণসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস নির্মাণ করেছে বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ‘ভূস্বর্গ কাশ্মীর’ নিসর্গসৌন্দর্যরাজ্য-ভ্রমণের অনবদ্য একটি গদ্যগাথা ।

তবে আধুনিক সময়ে ভ্রমণের কৌতূহল ও আগ্রহ কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। দেশ অতিক্রম করে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিনিয়ত আমাদের মন ধাবিত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই পরিচয়টিও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ‘শেরপাদের দেশে’। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাভূমির চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন চেমং লামা তাঁর ‘নগশীর্ষ নাগাভূমি’ গ্রন্থে। ‘পুনরাদর্শনায় চ’ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘চেকোশ্লাভিয়া’ (পূর্ব ইউরোপ) ভ্রমণের অতীব মনোগ্রাহী কাহিনী। ‘ভিয়েতনামে কিছুদিন’,‘ডাকবাংলোর ডায়েরী’ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভিয়েতনাম ভ্রমণের অত্যন্ত সুখপাঠ্য বর্ণনা।

সৈয়দ আব্দুল করি লিখেছেন ‘প্যালেস্টাইন থেকে আরব’। ইসরাইল দেশের একটি অনবদ্য ছবি উপহার দিয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ইজরেলা কিওরস কুরো’ নামক গ্রন্থে। দিলীপ মালাকারের ‘মস্কো থেকে মাদ্রিদ’ গ্রন্থে আধুনিক ইউরোপের এক ভ্রমণপিপাসু পথিকের অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছ।

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন ‘অচেনা চীন’।এই গ্রন্থে চীন সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছিল তা লেখকের দৃষ্টিতে অর্থহীন বলে মনে হয়েছে।

দেশ দেখার চোখ নিয়ে কাছে দূরে যাঁরা সুযোগ পেলেই ভ্রমণ করেন তাঁদের মধ্যে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর ভ্রমণের বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য দেশের সংস্কৃতির পরিচয় নেওয়া। দেশের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির যেসব ধারা একালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের ভাবধারার ও জীবনধারার অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় বহমান লেখক অমিয়কুমার তারই সন্ধান দিতে চেয়েছেন তাঁর ‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম’, ‘রূপবতী নগরী’, ‘দেখা হয় নাই’ গ্রন্থগুলিতে।

শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল লিখিত 'তপোভূমি নর্মদা' ৮টি খন্ডে শুধুই নর্মদা বা তৎপার্শ্ববর্তী স্থান পরিভ্রমণ নয়। এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষের শাশ্বত আধ্যাত্মিক ভাবধারার ও ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান করেছে। বহু যুগ ধরে ভারতের সাধু সন্ন্যাসীগণ নর্মদার দুই তীরে পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও লেখকের নর্মদা পরিক্রমা অনেক অজানা তথ্য বা 'মিথ'-এর সন্ধান দিয়েছে। এই গ্রন্থগুলি একাধারে ভ্রমণ ও সাহিত্যের দুই ধারাকেই পরিপুষ্ট করেছে।

নবনীতা দেবসেন আধুনিক যুগের প্রথিতযশা লেখিকা। তাঁর লেখা বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনী সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' , 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' গ্রন্থ দুইটি শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়, সাহিত্যরস সমৃদ্ধ অবিস্মরনীয় রচনাও বটে। লেখিকার রসবোধ ও মাত্রাজ্ঞান লক্ষ্য করার মত।তাঁর 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে'এক দুঃসাহসিক অভিযানমুলক ভ্রমণকাহিনী।গ্রন্থটি ভারত–পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইন বা বর্ডারের ভ্রমণকাহিনী মাত্র নয়, এই গ্রন্থ এক দুর্জয় সাহসের পরিচায়কও বটে।

অভিযানমূলক ভ্রমণকাহিনীও বাংলা সাহিত্যে নেহাত কম নয়। বিমল দে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর রচিত'সুদূরের পিয়াসী'তে তিনি দেশ-বিদেশ, সংস্কৃতি শিক্ষা সবকিছুকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কষ্টসাধ্য এই যাত্রা তাঁকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।বিমল দে'র 'মহাতীর্থের শেষযাত্রী' এক উৎকৃষ্ট রচনা। তিব্বত ও মানস সরোবরের এর দুর্গমতা লেখককে শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন করলেও অদম্য সাহস ও দুর্জয় মনোভাবকে যে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি এ গ্রন্থ তারই পরিচয় দেয়।

বিমল মুখার্জিও ১৯২৬-৩৭ এর মধ্যে সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তাঁর 'দুচাকায় দুনিয়া'-তে গ্রীনল্যান্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাঠকের মনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে গ্রিনল্যান্ড এর ইগলু বাসের অভিজ্ঞতা। অসুস্থ লেখককে কেমন করে সম্পূর্ণ বিদেশী এক বৃদ্ধা ঐ দেশীয় জড়িবুটি দিয়ে সুস্থ করে তোলেন তা পাঠ করলে পৃথিবীর সমস্ত মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামনাথ বিশ্বাসের 'অন্ধকারের আফ্রিকা'ও আরেকটি সুখপাঠ্য রচনা।

অতি সম্প্রতি আর একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে, সুকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'হিমালয় তীর্থে সাধুসঙ্গ'। এটি শুধু তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণপিপাসুর বর্ণনা নয়, নিরীশ্বরবাদী লেখকের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানও বটে। গ্রন্থের মূল সুরকে অতিক্রম করে লেখক এক মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

যে গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়ের 'দেশনায়কের পথে', অসীম কুমার রায়ের 'প্যারিস দর্শন', উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চরৈবেতি চরৈবেতি', কৃষ্ণা বসুর 'ভ্রমণ দেশে দেশে', তিলকরঞ্জন বেরার 'নিকোবরের দ্বীপে', শংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'পৃথিবীর শেষপ্রান্তে', সুদীপ্তা সেনগুপ্তর 'অ্যান্টার্কটিকা', সুতপা সেনগুপ্তর 'গ্রিস ও ইতালির প্রাচীন ভূমিতে', প্রদীপ মালহোত্রার 'এক ডাক্তারের কুমেরু স্মৃতি', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যাডভেঞ্চার ধর্মী এই ভ্রমণ কাহিনীগুলি কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

'সুমেরুবৃত্তের ওপারে' নিবেদিতা ঘোষ লিখিত অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণের আর এক আশ্চর্য ও উপভোগ্য ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা। ১৯৮৪ সালে ভারতের অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে অংশগ্রহণকারী লেখিকা প্রথম মহিলা বৈজ্ঞানিক, যিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।কষ্টসাধ্য, তথ্যসমৃদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন উপভোগ্য এই রচনাটি অন্যতম ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।-

"আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ? সকালে চোখ খুলে প্রথম এই পংক্তিই মনে এলো, আজ আমরা পৌঁছেছি পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তে। গ্লোবের মাথায় চড়ে বসেছি বলা যায়। এত বড় স্পর্ধা। পায়ের তলায় পৃথিবী। সামনে আমাদের দুস্তর বাধা। বরফ জমাট সুমেরু মহাসাগর, যা পেরোতে পারলে আর মাত্র

১০০০ মাইল উত্তরে ভৌগোলিক উত্তরমেরু। আমরা অবশ্য উত্তর মেরু বিজয়ের কেতন ওড়াতে আসিনি। আমরা এসে পৌঁছেছি আমাদের অভিযানের উত্তরতম বিন্দু, ৮০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। গ্লোবের মাথায় যে জায়গাটা সাদা টুপির মতো দেখা যায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সমুদ্র উধাও, শুধু ধুধু বরফের প্রান্তর । তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জাহাজ । নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না । কে বলবে এই ধুধু বরফ প্রান্তরের কয়েক মিটার নীচে লুকিয়ে আছে একটা আস্ত মহাসাগর। উদ্ভিদ প্রাণী সমেত একটা গোটা ইকো-সিস্টেম। বরফ শীতল নিস্তব্ধতা চারপাশে। বোধ যেন তার বাস্তব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধি-যুক্তি বিবেচনা কিছু কাজ করে না এই অতিকায়ের সামনে।"[১০]

ভ্রমণ-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির অবদানও আমাদের স্বীকার করতে হবে। 'ভ্রমণ', 'মুসাফির', 'সফর' ইত্যাদি পত্রিকা গুলি অনেক অজানা ভ্রমণস্থান ও তথ্যের সন্ধান দেয়। যার ফলে সাধারণ পাঠক সেই স্থানে যাবার জন্য তাগিদ অনুভব করেন। দেখা যায় যে এসব ভ্রমণকাহিনী পড়েও অনেকে উৎসাহিত হন। পত্রিকায় লিখিত লেখকদের বর্ণনা পড়েও তাঁরা ঘরে থেকেও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এইভাবেই ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলায় অজস্র ভ্রমণকাহিনী রচিত হয়েছে। এইসব ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে গল্প-উপন্যাস পাঠের মতোই রোমাঞ্চ ও বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায়। ভ্রমণ কাহিনীর মুখ্য বিষয় লৌকিক জগৎ। তারই স্পষ্ট চিত্ররূপ ও সেইসঙ্গে কাব্যরূপই হলো ভ্রমণকাহিনী। সব দেশের ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধেই এই কথাটি প্রযোজ্য। বাংলা ভ্রমণসাহিত্য তার জন্মলগ্ন থেকেই বিচিত্র বিস্ময়ে আপন গতিপথে অগ্রসর হয়েছে। উপরোক্ত লেখকদের লেখনীতে নবীন পৃথিবীর নতুন নতুন পরিচয় তুলে ধরার নিঃসংশয় শক্তির সংকেত ভাবিকালের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা ভ্রমণসাহিত্য এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখতে পারে।

গ্রন্থসূত্র-

১) রায়, দুর্গাচরণ, ১২৮৭ (১৮৮০),পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১

২) চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, ১৮৮০, পৃষ্ঠা ৯

৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ২৭

৪) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ২১

৫) ভারতী, রামানন্দ, ১৮৯৮,পৃষ্ঠা ১০৫

৬) নিবেদিতা, ভগিনী, পৃষ্ঠা ২৪

৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৬,পৃষ্ঠা ৪৩২

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৬,পৃষ্ঠা ৮০২

৯) মহারাজ, শঙ্কু, ২০০০, পৃষ্ঠা ১১১

১০) ঘোষ, নিবেদিতা, ২০২২, পৃষ্ঠা- ৪৯০

প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থঋণ-

রায়, দুর্গাচরণ। *দেবতাদের মর্ত্যে আগমন*। কলকাতা: পত্রিকা কল্পদ্রুম, ১২৮৭ (১৮৮০)।

চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র। *পালামৌ*। কলকাতা: বঙ্গদর্শন, ১৮৮০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্যের পথে*। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন,১৯৩৬।

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ। *আত্মজীবনী*। কলকাতা: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৯৮।

সান্যাল, প্রবোধকুমার। *মহাপ্রস্থানের পথে ও দেবতাত্মা হিমালয়*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৯।

অবধূত (মুখোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র)। *নীলকন্ঠ হিমালয়*। কলকাতা: মনামী প্রকাশনী, ১৯৬৭।

মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ। *কুয়ারী গিরিপথে*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৭।

ভারতী, রামানন্দ। *হিমারণ্য*। কলকাতা: সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ থেকে মাঘ, ১৮৯৮।

নিবেদিতা,ভগিনী। *Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda*। কলকাতা: স্বামী মুমুক্ষানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ১৩২৪।

ঘোষ, গৌরকিশোর। *নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ। *ভ্রমণ সমগ্র*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *য়ুরোপপ্রবাসী পত্র (রবীন্দ্র রচনাবলী,প্রথম খন্ড)*। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জন্মদিনে(রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড)*। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৪।

রায়, অন্নদাশঙ্কর। *পথেপ্রবাসে*। কলকাতা: বিচিত্রাপত্রিকা,১৯৩১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *তৃণাঙ্কুর*। কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশার্স, ১৯৩৭।

আলী, সৈয়দ মুজতবা। *শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,২০২২।

গোস্বামী, পরিমল। *বনপথের পাঁচালী*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৭৪।

অবধূত (মুখোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র)। *মরুতীর্থ হিংলাজ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৯।

অবধূত (মুখোপাধ্যায়, দুলালচন্দ্র)। *উদ্ধারণপুরের ঘাট*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৯।

বসু, সমরেশ। *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬।

মহারাজ, শঙ্কু। *বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২।

মহারাজ, শঙ্কু। *দেশের মাটি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং,২০০০।

দেবী, মৈত্রেয়ী। *অচেনা চীন*। কলকাতা: দেশ পত্রিকা, ১৯৮০।

ঘোষাল, শৈলেন্দ্রনারায়ণ। *তপোভূমি নর্মদা (উত্তরতট, দক্ষিণতট, অখন্ড)*। কলকাতা: তপোভূমি পাবলিশিং হাউস, ২০০৯।

দে, বিমল। *মহাতীর্থের শেষ যাত্রী*। কলকাতা: ভ্রমণ পত্রিকা, ১৯৮৫।

মুখার্জী, বিমল। *দু চাকায় দুনিয়া*। কলকাতা: ভ্রমণ পত্রিকা, স্বর্ণ প্রকাশন, ১৯৯৫।

মুখোপাধ্যায়, সুকুমার। *হিমালয় তীর্থে সাধুসঙ্গ* । কলকাতা: নবভারত প্রকাশন, ১৯৮৪।

দেবসেন, নবনীতা। *ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে*। কলকাতা:পুস্তক বিপণী, ২০২২।

সেনগুপ্ত, সুদীপ্তা। *আন্টার্কটিকা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২।

ঘোষ, নিবেদিতা। *সুমেরুবৃত্তের ওপারে*। কলকাতা: শারদীয়া দেশ প্রকাশন, ২০২২।